প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের অনুবিশ্ব : বৈচিত্রের নানা দিক

মৌসুমী নাথ

Abstract

The adventures novelist Debesh Roy, -- ignored the so-called conception of our literary world and developed his own fictional world with alternative space building. Except the four 'Pratibedans' and four 'Britantas' of the writer, if we deeply study the other novels and stories of him, we can feel the reality of our society. We can say that his novels and stories are indicating the various important sides of Bengali literature. From birth to death, from ordinary to extra ordinary, from lower to upper standard, from village to town -- in every stage of human life and society we can see there are lots of changes are going on. All these changes may not be explained through any explanation to the civil society or it seems to be challenging to our civil society. But if we want to prove it from our experience of life, then we can say, riders may achieve the success of intellect (perception of life) from these lessons.

বর্তমান শতকের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব দৃষ্টিকোণের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস রচনার পুরাতন পদ্ধতিতে অস্বীকার করে বাস্তব পটভূমিতে ছুটে চললেন কেবলমাত্র আখ্যানের আদল তৈরীর উদ্দেশ্যে। বাস্তবপটভূমিতে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি যে কেবল আখ্যান তৈরীর উদ্দেশ্যকে সফল করতে পেরেছিলেন তা নয়, দেখতে পেলেন বহু বৈচিত্রময় জীবন এবং পরিস্থিতি। চকিত হলেন সাহিত্যিক দেবেশ, যা কল্পনার অতীত তাও ঘটে চলেছে সমাজে। ভুলে গেলেন তিনি আখ্যানের আদল, সাহিত্যে উঠে। আসল কট্টর বাস্তব হয়তো এজন্যেই তার গল্পগুলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেনি। বিভিন্ন পরিস্তিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা দেবেশ রায়ের ছোটগল্পগুলো সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ যদিও সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচে নেই। বরং বলতে হয় গল্পগুলোর বৈচিত্রতাই গল্পগুলোকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে। তাইতো সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"তাঁর অনন্য ছোট-গল্পগুলির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন তিনি কখনো নিজের পুনরাবৃত্তি করেন না।"[১]

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়হলো 'দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২' –এর নির্বাচিত কয়েকটি গল্প, যে গল্পগুলো প্রত্যকটি তাদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজস্বতা বজায় রেখেছে। একের সাথে অপরের পার্থক্যই যেন বিষয়গুলোর অভিনবত্ব দান করে। এক গল্পের পরিসমাপ্তির পর সেই ভাবনাকে বিদায় দেওয়ার পূর্বেই যেন পাঠকমণ্ডলী আগামী গল্পের জন্য রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি অনুভব করতে পারে।

গল্পকার দেবেশ রায় সমাজের বিভিন্ন দিকগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পগুলোতে। অনেক সময় সাধারণ কাহিণির মধ্য দিয়ে এক অন্যরকমের চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখি আমরা। তাঁর ছোট গল্পগুলো সম্পর্কে অশ্রুকুমার শিকদার যা বলেছেন তা উল্লেখ করলে পাঠকমণ্ডলীর ধারণা আরও স্পষ্ট হবে – গল্পের গল্পকে উপস্থাপনার নতুন নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়িয়েছেন দেবেশ রায়, এই আধুনিক সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক গল্পকার। বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নিতে চান তিনি, আর তাই তাঁর গল্পে অনুপুঙ্খের এতো গুরুত্ব। গল্পের বাস্তবতাকে তাঁর গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র স্তরে তুলে দেয়। ..... দেবেশ মেধাবী গল্প অনেক সময় জ্যামিতিক প্রতিপদ্যের মতো হতে পারে প্রায়। রাজনীতি মানে যে দৈনন্দিনের ভিতরে এক স্বপ্নের সঞ্চার। সেই রাজনীতির স্বপ্ন থেকে কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যে সব গল্প লিখেছেন দেবেশ তার মধ্যে অনেক জটিল জিজ্ঞাসা, সেখানে প্রত্যক্ষ অন্বিত হয় পরোক্ষের সঙ্গে, সবকিছুই আবার এক তত্ত্ববিশ্বের অন্তর্গত হয়ে ক্রিয়াবান, কেননা চৈতন্যের যন্ত্রণা ও মীমাংসা থেকে নিস্তার নেই।[২]

দেবেশ রায় কখনই সমাজ বা বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি আবার মনস্তাত্বিক দিক থেকেও যে তিনি সরে দাঁড়াননি তাঁর প্রমাণ বার বার তাঁর সাহিত্যভুবনে মিলেছে। দেবেশ রায়ের ছোট গল্পে কখনও উঠে এসেছে নিম্নবর্গ আবার কখনও উঠে এসেছে মানসিক দ্বন্দ্ব আবার কখনও উঠে এসেছে কল্পজগতের বিভিন্ন চরিত্র, যাদের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ছোটগল্প আলোচনার ক্রমবর্ধিত পরিসরে এর পরিচয় মিলবে। গৌড়চন্দ্রিকাকে অতিরিক্ত দীর্ঘায়ত না করে এবার আলোচ্য গল্পগুলোতে উত্তরণ করা যাক।

'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পটি একটি রহস্যময় গল্প। গল্পটি অলৌকিক না কোনও করুণাময় কাহিনী তা নির্ণয় করার দায়িত্ব লেখক পাঠকের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। কাহিনীর শুরুতে এমন একটি জায়গা বা বলা যেতে পারে এমন একটি স্টেশনের চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে যেখানে কোন ভৌতিক ঘটনা বা কোন দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। এক যাত্রীবাহী ট্রেনের এক কামরার সাধারণ কিছু যাত্রীদের নিয়ে কাহিনীটি নির্মাণ করা হয়। মা,বাবা, ছেলে, মেয়ে কয়েকজন যুবক ও কিছু একক ব্যক্তি নিয়ে ট্রেনের কামরা পুরোপুরি ভিড় ছিল। যাত্রীসংখ্যা অধিক হলেও ট্রেনে ভালো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। নির্জীব বাতিগুলো তাদের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কামরাগুলোতে আলোদান করছিল। দুর্বল এই আলোর নীচে বসেই সমস্ত যাত্রীবাহী তাদের কথোপকথন চালিয়ে যাত্রীটিকে মোটামুটি ভাবে বিরক্ত বোধের পর্যায়ে ফেলে দেননি। কথোপকথনের মাধ্যমে ট্রেনের কামরাটির প্রত্যেক প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হয় এবং কামরার অচেনা পরিবেশ একটি স্বাভাবিক পরিবেশে পরিণত হয় তখন একজন ভদ্রলোক (পোর্টফোলিও) আগামী স্টেশনে প্রত্যেক চুরির ঘটনা সমর্কে সকলকে অবগত করান। অন্ধকার রাত্রিতে ট্রেন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। রাত্রি যখন মধ্যম পর্যায়ে এগিয়ে যায় তখন প্রায় সবাই ক্লান্ত। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যখন সবাই নিজ নিজ জায়গা দখল করে শুয়ে পড়ল তখন দুরন্ত ট্রেনের দরজায় এক অদৃশ্য গলার আওয়াজ শোনা গেল যা এক ভ্রান্তি ছাড়া প্রথমে অন্য কিছু মনে হয়নি। সে আওয়াজে যে বাক্য উচ্চারিত হলো তা কোন অনুরোধ ছিল না, এরকম আদেশ ছিল, দরজাটা খুলুন' – কথাটি প্রথমে সবাই শুনলেও ভ্রান্তি মনে করে কেউ কোনও জবাব দেয়নি। তারপর কথাটি আরেকটু স্পষ্টভাবে আরেকটু জোরে শোনা গেল। তারপর আবার এবং বারবার এবার দরজায় লাথি মারার শব্দ। দরজা ভাঙার চেষ্টা। এই জায়গায় পাঠকের মনকে দেবেশ রায় একটু উসকে দিয়েছেন। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনের মধ্যে কোন ব্যক্তির কী ওঠা সম্ভব?

কিংবা খোলা মাঠে ট্রেনের গতি একটু ধীর হলে কোনও মানুষ যদিও ট্রেনে উঠতে পারে, কিন্তু এত রাত্রীতে কোনও মানুষের পক্ষে খোলা মাঠে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা কী সম্ভব? যদিও কোনও মানুষ খোলা মাঠ থেকে ট্রেনে উঠে যায় তবে কী চলন্ত ট্রেনে দীর্ঘসময় ধরে ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব? স্টেশন আসার আগেই 'দরজাটা খুলুন' – কথাটি মিলিয়ে গেল কেন? তবে কি এটা কোনও আলোকিক ঘটনা না কোনও অসহায় ব্যক্তির প্রাণভিক্ষার আর্তনাদ ছিল? এতগুলো প্রশ্নের মীমাংসা দেবেশ রায় নিজে করেননি। তবে এর উত্তর খোজার জন্য পাঠকের চিন্তাবিশ্বে খোলা জায়গা তিনি তৈরী করে দিয়েছেন। পাঠক সমাজ তাদের উত্তর কীভাবে বের করল এবং কোনদিকে পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করল তা নিয়ে লেখকের মাথাব্যথা নেই।, তবে যাত্রা শেষে যে এই ঘটনা সকলের মনে দাগ কেটেছে তা স্পষ্টভাবেই লেখক বুঝিয়েছেন। কোন যাত্রী হয়তো এই ভয়ানক ঘটনা থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য স্বস্তি বোধ করেছেন। আবার কেউ হয়তো এক অসহায় ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে নিজেকে দোষী মনে করে গ্লানিবোধ করেছেন। গল্পের শেষ লাইনগুলোতে কথাগুলির প্রমাণ পাওয়া যায় –

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে থেকে যারা শেষে একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল, তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি এবং হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আর এক মানুষ হয়ে গন্তব্যে পোঁছেছিল। কিন্তু মানুষগুলিই বদলে যাওয়ায় গন্তব্য ও আর স্থির থাকেনি।[৩]

দেবেশ রায় কি এখানে কেবল এক আধিভৌতিক কাহিণিরই উত্তরণ ঘটিয়েছেন না কি এর পিছনে তাঁর কোনো উদ্দেশ্যে কাজ করছিল তা নির্ণয় করতে শিখবে ঠিক তখনই এর উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব। যাইহোক গল্পের সমাপ্তিতে পাঠকমণ্ডলীকে দ্বিধায় ফেলেই দেবেশ ছুটলেন তাঁর আগামী গল্পে আগামী পরিসর নির্মাণের তাগিদে।

'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পটি 'দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২'-এর ৪র্থ নং গল্প। পূর্বটির থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী কাহিনি এবং কাহিনীটি তার ভিন্ন ধর্মিতা নিয়ে আপন বৈশিষ্ট বজায় রেখেছে। গল্পসমগ্রের ভূমিকাতেই আমরা দেখেছি জলপাইগুড়ি, তিস্তা নদী, রাজবংশী ইত্যাদির সঙ্গে দেবেশ রায়ের একটি আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হয়। এই ছোট গল্পে তারই একটি গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। রাজুবংশী ছেলে ভাইদুয়ের একদিনের জীবনযাত্রাতে তিস্তা নদীর মহিমা আমরা জানতে পারি। তাছাড়া তিস্তাপারের বার্ণেশ ঘাটত উল্লেখিত জায়গাগুলোর মত আমাদের পরিচিত স্থানের তালিকার একটি অংশ হয়ে যায়।

কাহিণিটিতে 'বার্ণেশ ঘাট' কিংবা 'বার্ণেশ জংশন' নামটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বার্ণেশকে কেন কখনও ঘাট এবং কখনও জংশন বলা হয় তার কারণ কাহিণির শুরুতেই বিবৃত হয়েছে। লেখকের কথা অনুযায়ী এই বার্ণেশের সৃষ্টি হয়েছে চতুর্দিকের ভূখণ্ডের যোগাযোগ সূত্র তৈরী করার জন্য। তাই এটি কখনও জংশন আবার কখনও ঘাট। যদিও জংশন মৃত প্রায় এবং ঘাটটি বিপজ্জনক, তথাপি এই বার্ণেশের মধ্য দিয়েই চারদিকের ভূখণ্ডের যোগাযোগ ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। বার্ণেশ জংশন তখন মৃত, তবে জংশনের নানা চিহ্ন তখনও রয়েছে। অপরদিকে বার্ণেশ ঘাট পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বার্ণেশ ঘাটে দাঁড়িয়েই গল্পের নায়ক ভাদুই তিস্তার নানা লীলা দেখতে অভ্যস্ত। তার চেয়ে ভালো করে তিস্তাকে যেন আর কেউ চিনতে পারে না। শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকাল-প্রত্যেকটি ঋতুতে তিস্তার পরিবর্তনশীল চেহারা ভাদুইকে আকৃষ্ট করে। বার্ণেশ ঘাটের বিপদ শীতকালেই বেশী দেখতে পায় ভাদুই, কারণ তখন তিস্তার প্রায় দেড় মেইল চর। বর্ষাকালে ঐ চর গলাজল ও বাঁশ বনে ভর্তি

হয়ে যায়। কাহিনীটিতে তিস্তার বারমাস্যার জীবনযাত্রার সাথে ভাদুইর জীবনযাত্রার কোথাও যেন একটা মিল খঁজে পাওয়া যায়। তার আলাদা করে আপন দুঃখ বেদনাকে ফুটে উঠতে দেখা যায় না। সে তিস্তার সঙ্গেই আষ্টে পৃষ্টে লেপ্টে আছে। তার নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই। দুটো প্যান্ট আর দুটো ছুবিওয়ালা গেঞ্জিই তার সম্বল, নিজস্ব কোনও ব্যবস্যা তার নেই। যখন যে দোকানে কাজের জন্য তাকে ডাকা হয় তখন সেখানেই সে কাজ করে। হিন্দু হোটেলে বাসন মাজার বিনিময়ে দুপুরের খাবার খায় আর রাত্রিতে ড্রাইভার বা কণ্ডাক্টারের সাথে বাসেই ঘুমোয়। এছাড়া শীতকালে বাসের প্যাসেঞ্জার জোগাড় করা এবং বর্ষাকালে নৌকার প্যাসেঞ্জার জোগাড় করা তার কাজ। এই করেই তিস্তাপারে ভাদুইর প্রাত্যাহিক জীবন কেটে যায়। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিস্তার কখনও হৃদয়হীন চেহারা ভাদুই দেখতে পায়। নৌকাচালক ওভার সিং ও রাবণের মধ্যে প্রতিযোগিতা ধরিয়ে সে সেই প্রোতিযোগিতা দেখে না, দেখে তিস্তার লীলাকাণ্ড। ভাদুই শুধু সমস্ত কাজে দক্ষ ছিলনা, সে হরেকরকম লৌকিক গান জানত এবং তিন চার রকমের ভাষাও (রাজবংশী, হিন্দী, ভাটিয়া, বাংলা) জানত। স্বাধীন ভাদুই তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রায়ই মৃত বার্ণেশে জংশনের পরিচয় দিত। যেমন –

হে-ই চল আয়া, চল আয়া, ধূপগুড়ি ইস্পেশাল, নর্থবেঙ্গল, এক্সপ্রেস, পয়লাঘণ্টি, ডং ডং ডং ডং ডং ডং – এ.এ.আমন, চলি আয়, পিসিঞ্জার আসি গিয়ে।[৪]

ভাদুইর জীবন যাত্রাকে দেবেশ রায় তিস্তার সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে কাহিনী শেষে একে অপরের পরিপূরক বলেই মনে হয়। যেন তিস্তা না থাকলে ভাদুই নেই এবং ভাদুই না থাকলে তিস্তারও অস্তিত্ব নেই। অপরদিকে ওভার সিং ও রাবণের লড়াইয়ে জেতার আনন্দ ও হারের বেদনায় আপ্লুত হয়ে তারা আপন মত্ততায় ব্যস্ত হল বটে, কিন্তু এই আনন্দ কিংবা বেদনা যে তিস্তার জলের তলে নির্ধারণ করা রয়েছে তা হয়তো এই অজ্ঞান ব্যক্তি দুটো বুঝতে পারেনি। যাত্রা শেষে যখন সবগুলো নৌকাঘাটে একত্রিত হয়ে দাঁড়াল তখন এক বিপজ্জনক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ছাড়া অন্যকিছু মনে হয় না। কবে এই বিপদ কাটবে, কবে জংশন আবার জীবিত হবে, কবে ভাদুই পাহাড়ে যাবে এখন ভাদুইয়ের সেই অপেক্ষাই রইল—

“ভাদুই রাজবংশী জানে, ভাটিয়া জানে, হিন্দি জানে –

যে করেই হোক পাহাড়ি ভাষা ভাদুইকে শিখতেই হবে।[৫]

ভাদুই চরিত্র সত্ত্বার মধ্যদিয়ে যে লেখক নিজেকেই উপলব্ধি করেছেন এতে সন্দেহ নেই। যে তিস্তা নানা সুযোগে, প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে নানাভাবে দেবেশের লেখনীতে বারবার এসেছে সেই তিস্তা এবং ভাদুইর সম্পর্ক যেন শুধু তাদের থাকে না প্রবেশ ঘটে স্বয়ং গল্পকারের। তিস্তার অফুরন্ত অলিখিত রহস্যের প্রতি রোমাঞ্চকর সুড়সুড়ি যেন এখানে কাহিনীর একটি উদ্দেশ্য হয়ে থেকে যায়।

‘মর্তের পা’ একটি সামান্য ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে শোষণের এক স্বচ্ছ প্রতিছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দেবেশ রায়। এই ছোটগল্পটি রাজনৈতিক পটভূমিকার সেইসমস্ত উঁচুতলার মানুষদের প্রতি অঙুলি নির্দেশ যারা নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্তু তারা হয়তো এটা ভুলে গেছেন যে --

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। (দুর্ভাগা দেশ)

অবহেলা করে সাধারণ মানুষদের যেভাবে বঞ্চিত করা হয়, যেভাবে সাধারণের সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে হয়, বিভিন্ন উপায়ে সাধারণের জীবনযাপন যেভাবে দুর্বিষহ করা হয় ঠিক

সেইভাবেই কোনও না কোনও সময় এর প্রতিক্রিয়া শোষক দলের উপরও পড়তে বাধ্য তারই একটি ক্ষুদ্র ছবি 'মর্তের পা' ছোটগল্পটি থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করছে।

গল্পের নামকরণেই বোঝা যায় এখানে বাস্তবকে তুলে ধরতে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গল্পটিতে স্বর্গের দৈনন্দিন একটি অলসপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গরাজ্যে সকালবেলা সূর্যদেব ভ্রমণে বেরিয়েছেন, জয়া বিজয়া পার্বতীকে সাজাবার জন্য ফুল তুলছেন, শিবের বলদকে নন্দী-ভৃঙ্গী ভুষি খাওয়াচ্ছে ইত্যাদি কাজে স্বর্গরাজ্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে তবে এই ব্যস্ততা দীর্ঘ সময়ের নয়। অপরদিকে চিত্রগুপ্ত যমদূত, দেবদূত ও উপদেবতাদের দৈনন্দিন কাজ নির্ধারণ করে তাদের পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন। যমদূতদের চেহারাছবি দেবদূতের তুলনায় অধিক মানানসই। দেবদূতদের কাজ জন্ম সম্পর্কিত এবং যমদূতদের কাজ মৃত্যু সম্পর্কিত। এছাড়া জন্ম-মৃত্যুর ব্যালান্স ঠিক রাখার কাজ উপদেবতার। কিন্তু চিত্রগুপ্ত উপদেবতাকে অফ ডিউটিতে রেখেছিলেন এবং কাজ শেষ হওয়ার আগেই ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চিত্রগুপ্ত মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন। উপদেবতা এবার প্রায় বিনা অনুমতিতেই পৃথিবীতে চলে আসলেন। দুপুর দিকে স্বর্গরাজ্য আলস্যতায় ভরপুর থাকে। সমস্ত দেবদেবী যখন আপন মত্ততায় ব্যস্ত তখন স্বর্গের দ্বারে কালো ধোঁইয়া দেখা দিল। মর্ত থেকে সেই ধোঁয়া এমনভাবে উঠে আসছিল যে প্রথমে মনে হল তা স্বর্গরাজ্যকে ধ্বংস করে তারও উপরে চলে যাবে। এই ধোঁইয়া দেখে প্রহরী সিংহ দুয়ারের শংকা ঘণ্টি বাজাতে শুরু করলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের অবস্থা এমন করুণাময় যে শংকা ঘণ্টিতেও এখানে মরচে পড়ে গেছে। যাইহোক সমস্ত দেবদেবী যখন প্রায় উন্মাদ হয়ে রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন তখন সকলেরই প্রায় মতিভ্রম। স্বর্গরাজ্যের অবস্থা নিম্নোক্ত কোটেশন থেকে কিছুটা আঁন্দাজকরা যেতে পারে –

"ইন্দ্র এসে সিংহাসনে বসে বললেন, নাফোচের ব্যাপার যা আছে সেরে নাও।

ভরতমুনি বললেন, হে সহস্রমার্তন্ততময় দেবরাজ ইন্দ্র, যাঁর প্রভায় –

আরে ঐসব বিশেষণগুলো বাদ রেখে ক্রিয়াগুলো আগে করো, দেখছ না কালো ধোঁইয়ায় – শিব খেঁকিয়ে উঠলেন, ভরত বললেন, এই বিপৎকালে কোনও গর্ন্ধব বা অপ্সরাই নৃত্যে সম্মত হচ্ছে না, পাছে কোনও দেব বা দেবী তাঁদের অভিশাপ দেন এবং এই প্রলয়কালে তাঁদের আবার মর্তে যেতে হয়।

ইন্দ্র বললেন, ন্যাকামি! কেন? অভিশাপ দেওয়ার পর তো আবার কাটিয়েই দেওয়া হয়। যা নিয়ম, মানতেই হবে, যাও শুরু করো তাড়াতাড়ি।"[৬]

স্বর্গরাজ্যের বিশৃংখল অবস্থার সাথে সাথে ইন্দ্রের উক্তিতে এও বোঝা যায় সে সমস্ত কিছুই পূর্বনির্ধারিত। শোষণ যখন চরম পর্যায় পৌঁছে যায় তখনই দেখা যায় বিভিন্ন চেতনাবাদের উত্থান। তাই সেদিন স্বর্গরাজ্যকে বিশৃঙ্খল করে মর্তের সমস্ত চেতনাবাদীরা উঠে এসেছিল। শোষিত-নিপীড়িত-নির্যাতিত মানবজাতি সঠিক বিচারের আশায় শোষণের নগ্নতাকে নিয়ে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়। বিষাক্ত পৃথিবীতে তারা তাদের উত্তরসূরীদের আনতে নারাজ। একদল নগ্ন পোয়াতি মেয়েরা সঠিক বিচারের জন্য স্বর্গের দ্বারে নক করেছিল। মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ পূর্ণ গর্ভবর্তী, কেউ কেউ আট, নয় মাসের। এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি প্রতিটি মাসের পোয়াতি মেয়েরা সেখানে উপস্থিত। এমন কী এক-দুই-তিনদিনের পোয়াতি মেয়েরাও সেখানে ছিল। তাদের মধ্যে কারুর কারুর প্রসব বেদনাও ছিল। তথাপি তারা সন্তান জন্ম দেবে না। কারণ জন্মের পরদিনই হয়তো মর্তের বিষাক্ত কালো গ্যাস তাদের সন্তানকে গ্রাস করবে। ঠিক এমন সময়

প্রবেশ ঘটে যমদূতদের। তারা রাশি রাশি মৃতদেহের সাথে স্বর্গে উপস্থিত হয়। সেদিন মর্তে মৃতের সংখ্যা তেষট্টিগুণ বেশী ছিল। এই কারণে সমস্ত মৃতদেহর যমপুরীতে জায়গা হয়নি। দেবতাদের অবিচারে একদিকে প্রাণহারানো রাশি রাশি দেহ অপরদিকে গর্ভবতী নগ্ন মেয়েদের সঠিক বিচারের প্রতীক্ষারত অবস্থা। সেই প্রতীক্ষার মেয়াদ কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক ঘণ্টার নয়। যুগের পর যুগ ধরে এই প্রতীক্ষা চলছে, কিন্তু এখন আর না। তাই দেবেশ রায় এই সময়কে বলছেন, 'যুগসন্ধি'। গর্ভবতী মায়ের গর্ভ থেকে সেই পূর্ন বিকশিত শিশু কিংবা অর্ধবিকশিত শিশু কিংবা ভ্রূণ প্রত্যেকেই যখন চিৎকার করে উঠল 'আমরা জন্ম নেব না' তখন গর্বিত মায়েরা তাদের পায়ের তলায় দেবতার পুতুলকে এক মুহূর্তে গুড়ো করে দিল। জয় ঘোষিত হল মর্তের পায়ের।

গল্পটি নিঃসন্দেহে কাল্পনিক তবে এর পিছনে লুকিয়ে থাকা শোষণের ভয়ানক চেহারা আর কাল্পনিক থাকে না। ভারতবর্ষের শত সহস্র শোষিত মানুষ যখন নগ্ন পোয়াতির প্রতীক চিহ্নরূপে দেবতা নামক বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মুখে বিদ্রোহের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয় তখন যে কালো ধোঁয়াকে স্বর্গের সুখময় পরিবেশকে কলুষিত করতেই হবে এই কথা বুঝতে আর বাকী থাকে না। যাইহোক 'মর্তের পা' ছোটগল্পটি এক বিদ্রোহের বার্তা নিয়েই পাঠকমণ্ডলীর কাছে হাজির হয়।

বাস্তব জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক দেবেশ যে কত ধরণের ছোট গল্প লখেছেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে তুলে ধরার সামান্য চেষ্টা রয়েছে। 'উদ্বাস্তু', 'কলকাতা', 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' ইত্যাদি গল্পগুলো তাঁর সাহিত্য ভুবনের এক প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণের সহায়ক। 'অমলেন্দুর, মালতীর ও আরও কয়েক প্রকারের ভালোবাসা' গল্পটি এবারের আলোচ্য বিষয়। গল্পের নায়ক অমলেন্দু দেশদ্রোহী বলে ঘোষিত, কিন্তু সে কী সত্যিই দেশদ্রোহী তা নিয়ে সংশয় আছে। গল্পের প্রথমে অমলেন্দুকে আমরা প্রতিক্ষারত অবস্থায় পাই। নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে সে পুলিশের অপেক্ষায়, অত্যন্ত সতর্কভাবে যাতে কেউ টের না পায়। এই অপেক্ষারত অবস্থায় কতকী কল্পনা তার মাথায় আসে। সে ভাবতে থাকে জীবনটাকে উপভোগ করার কত উপায় আছে তার কাছে। চিন্তাজগতে এমন সময় মালতী উঁকি দেয়। মালতীদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে আসাই জীবনকে ভোগ করার সর্বোত্তম উপায় হবে। কিন্তু সেখানে কী যাওয়া সম্ভব? কল্পনার সূতাকে অমলেন্দু এবার টানতে থাকে। সেখানে গেলে দেশদ্রোহী হিসেবে পরিচিত অমলেন্দুর উপর হামলা হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আগে হামলা করে, সে কী দেশপ্রেমিক না মালতী প্রেমিক? যদি সে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয় তবে তো অমলেন্দুর উপর হামলা করবে না। তার মানে নিঃসন্দেহে এ মালতী প্রেমিক। সেদিন সব জেনেশুনেও অমলেন্দু সেখানে গিয়েছিল যদিও শান্তিদা তাকে বহুবার বারণ করেন। অমলেন্দুর জিন্তাজগতে এবার শান্তিদার প্রবেশ ঘটে। শান্তিদা তাকে সন্তানতুল্য ভালোবাসেন। মনে হয় দেশদ্রোহী হিসেবে তিনিও পরিচিত। তাই পরদিন পুত্রসুখ লাভ করতে পারবেন কিনা এই আশঙ্কায় ছেলেকে বারবার আদর করলেন। অমপ্লেন্দু এইভাবেই অপেক্ষারত অবস্থায় নস্টাল জিয়ার মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে থাকল –

কারণ শেষরাত্রিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই অপেক্ষা করতে করতে হাসি, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিরক্তি, ঘৃণা, আনন্দ ইত্যাদি মনোবৃত্তিগুলোর প্রবেশ-প্রস্থান তো চলতে থাকবেই।[৭]

অমলেন্দু দেশপ্রেমী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার সঠিক সুযোগ পেয়েছে। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে আজ তা প্রমাণিত হবে। ঘুম যাতে না আসে সেই চেষ্টায় অমলেন্দু সিগারেট জ্বালালো। সিগারেটের আলো মশরীর ছাদ অবধি পৌঁছাতেই মশারী সংক্রান্ত চিন্তায় অমলেন্দু হারিয়ে গেল। একবার এক মশারী তৈরীর জন্য মশারীর মাপ দিলে দর্জি

তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কী মশারীর ভিতর মারপিট করবে না কি? অমলেন্দুর মা অমলেন্দু যাওয়ার পর মশারী যত্ন করে রাখবেন নিশ্চয়, এমন সময় কল্পনার জালে ভঙ্গ ঘটে দরজার বাইরে কার ডাক শুনে। অমলেন্দুকে অকস্মাৎ যেতে হল।

কাহিনীতে মালতীর প্রবেশ ঘটে। মালতী সারাদিন স্কুল এবং বাকী সময় ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু একটা মুহূর্ত আসে যখন সে আর নিজের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারে না। অমলেন্দুর দেশদ্রোহী ঘোষিত হওয়ার বিষয়টি সে কোনও মতেই মেনে নিতে পারে না। সে জানে যে সে অমলেন্দুকে ভালোবাসে আর অমলেন্দু ভালোবাসে দেশকে। অমলেন্দু এখন কেমন আছে, কোথায় আছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে জানার জন্য মালতী ছটফট করতে থাকে। শতসহস্র বাধা সত্ত্বেও মালতী বেশ্যা পাড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে যায় অমলেন্দুর বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে যা শুনতে সে গিয়েছিল তা শুনার সাথে সাথে সংযোজিত হল আরও এক কাহিনী আরও কয়েক ভালোবাসার।

অমলেন্দুর স্ত্রী লক্ষ্মী দেখতে শুনতে খুব একটা ভালো নয়, তবে শরীরে জোর আছে। অমপ্লেন্দুর সাথে বিয়ের পর তিন সন্তানের সাথে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে পাঁচ সাত বছর তার খুব ভালোই কাটে। কিন্তু পরপরই পালটে গেল দেশের পরিস্থিতি আর সাথে পাল্টালো অমলেন্দু। দেশপ্রেমিক দেশের সংকটময় মুহূর্তে কী স্থির থাকতে পারে? পারে না। দেশপ্রেমিককে সংসার ছেড়ে পনেরো বছরের জেল হাজতে যেতে হল। রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে যখন সমাজ অস্থির তখনই লক্কমী বৌদির শ্বশুরমশাই মারা যান। দেশ-স্বাধীনকালে অমলেন্দু ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে এল ঠিকই কিন্তু তার মানসিক অবস্থা প্রেমিকাহারা প্রেমিকের মত। হটাৎ একদিন সে শুনতে পেল অমলেন্দুকে ধরে নিয়ে গেছে। তখন লক্ষ্মী আবার গর্ভবতী। এই করুণ সময়ে পাড়ার লোকেরাই তার পাঁশে দাঁড়ালো। চার বছর পর অমলেন্দু বাড়ী ফিরলে তাকে আর মানুষ বলে চেনাই যায় না। শরীরে শুধুমাত্র কতগুলো হাড়। জেলে অনশন করতে করতে যখন তার মরণাপন্ন অবস্থা তখনই তাকে পুলিশকর্মীরা বাড়িতে ফেলে গেল। লক্ষ্মী এবারও হার মানল না। মানুষটাকে সুস্থ করে তুলল। সুস্থ হতে না হতেই প্রেমিক ছুটল প্রেমিকার উদ্দেশ্যে। তবে এবার সাংসারিক কর্তব্য পালন করাও অমলেন্দুর দিনিলিপির তালিকায় প্রবেশ করে। কিন্তু লক্ষ্মীর কপালে সুখ নেই। দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষিত করে তাকে আবার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার লক্ষ্মী একা নয় তার পাশে ছিল তার যুবক পুত্র খোকন।

মালতী ও লক্ষ্মী দুজনেই অমলেন্দুকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অমলেন্দুর ভালোবাসা দেশের প্রতি উজ্জ্বল ভাবে কাহিনীতে ফুটে উঠে। তার উচ্চারিত একটি লাইন মালতী ও লক্ষ্মীর সাথে সাথে পাঠক সমাজকেও আচম্বিত করে। -- দেশদ্রোহী বড় ঘুম পাচ্ছে।

সাধারণ একটি লাইনই সত্যিকথা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল। অমলেন্দু দেশদ্রোহীর স্মৃতি নিয়ে মালতী আবার বেশ্যাপাড়ার মাঝে দিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়।

গল্পে উল্লেখিত তিনটি ভালোবাসাই খাঁটি অথচ প্রত্যেকেই পীড়িত। মনের যন্ত্রনাকে কোনও ভাবেই এরা এড়িয়ে চলতে পারে না তারা কিন্তু তারপরও দৈনন্দিন রুটিনে বাধা। মনে সমস্ত যন্ত্রণাকে চেপে রেখে দৈন্দন্দিন রুটিনে চলাতেই মানবজীবনের গভীর জীবনবোধ ফুটে উঠে। এক গভীর বাস্তব এবং মনস্তাত্বিক দিকটিই যেন গল্প উত্তরণের মূল উদ্দেশ্য।

'যুযুৎসু' গল্পের নায়ক মনীন্দ্রনাথ চৌধুরী পেশায় বেয়ারা। অন্য একটি কলেজের বেয়ারার চাকরী নিতে চান তিনি। তবে এবারেরটি সরকারী। এটার মাইনে ভালো পেনসন আছে এছাড়া আরও একটি কারণ আছে যে কারণটাই আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।

গল্পের নামকরণেই রয়েছে মূল কাহিনীর ইঙ্গিত। 'যুযুৎসু' অর্থাৎ যুদ্ধ করবার আগ্রহ যা দেয়। যুযুৎসু কাহিনীর নায়ক মনীন্দ্র নাথের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য চাপা অবস্থায় থাকে, কোনও একসময় তারও বিস্ফোরণ ঘটে। কাহিনীর প্রথমে মনীন্দ্রনাথকে চাকুরীর ইন্টারভিউর জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় দেখা যায়। সেখানে সে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল তাতে তাকে অত্যন্ত সাবধান সতর্কভাবে দেখা যায়। এই সাবধানতার কারণ ছিল তার নামটা ডাকার এক গোপন ভয়। যদি বেয়ারা এসে স্পষ্ট ভাবে জোরে 'মনীন্দ্র চৌধুরী' বলে ডাকে তবে এমন কী হতে পারে যারজন্য মনীন্দ্র অত্যন্ত সতর্কভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেয়ারাকে পুরোনাম ডাকার সুযোগ দিতে চায় না। মনীন্দ্রকে এই রকম অবস্থায় নানারকম কল্পনার আশ্রয় আমরা নিতে দেখি। আর প্রথম কল্পনাই হলো উর্দি কেন্দ্রিক। এখানে চাকরী পেলে তাকে উর্দি পরতে হবে যাতে কলেজের নামে লাগানো একটা বেচ থাকবে। এটা কী মনীন্দ্রনাথের কাছে সম্মানজনক হবে। তবে পড়ার আলাদা একটা অভিজ্ঞতা তো হবে আর এখানে মাইনে ভালো, পেনশন আছে আর আছে আরও একটা কারণ, মনীন্দ্রপালের ছেলে ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করেছে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে আসার কোনও সম্ভাবনা তার নাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মেয়ে যে কলেজে পড়ে সে কলেজে তাকে আর কাজ করতে হবে না। তবে এখানে কাজ পেলে মনীন্দ্রপালের উর্দি ও বেচ দেখে সবাই তাকে বেয়ারা বলে চিনে নিবে অথচ মেয়ের কলেজে সে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছে যেখানে অনেকেই তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ও ভালোবাসে। মাঝে মাঝে তার নিজেকে বেয়ারা বলে মনে হয় না।

মনীন্দ্র চৌধুরীর ইন্টারভিউর জন্য ভিতর থেকে ডাক আসল। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা। সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জনের সাথে সে ব্যক্তিগতভাবে দেখাও করেছে। তার বিশ্বাস যে সে চাকরীটা পাবে। সাক্ষাতকারে তাকে কয়েকজন বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে সবগুলোর উত্তর দিতে সমর্থ হয়। সাইকেল চালানোর বিষয়ে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় তখন সে উত্তরে বলেছিল –

'আজ্ঞে না স্যার, শিখে নেব।' একচল্লিশ বছরের বয়স্ক লোকের মুখে এই কথা শুনে বোর্ডের সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল। মনীন্দ্রনাথের পক্ষে বোঝা সম্ভব হল, এ চাকরী তার হচ্ছে না। তবে হার মানতে তার মোটেই ইচ্ছে নেই। তাই বোর্ড মেম্বার তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করায় সে অত্যন্ত গর্ভবোধ করল। তবে এ চাকরী করার কিংবা উর্দি পরার প্রচণ্ড ইচ্ছা ইতিমধ্যে তার চলে আসে। সে বেয়ারাকে লক্ষ্য করে নিজের মধ্যেও এক নতুন মনীন্দ্রকে আবিষ্কার করে। সে কল্পনা নিজেকে বেয়ারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। উর্দিপরা মনীন্দ্রবাথের আত্মপরিচয়ে যখন সে আপ্লুত তখনই দেবেশ রায়ের ভাষায় পেঁইয়াজের খোলসগুলো খুলতে থাকল।

মনীন্দ্রনাথ পূর্বে কন্টোলের দোকানের খাতা লেখার কাজ তারপর ঔষধের দোকানে কম্পাউণ্ডারির কাজ তারপর সিনামা হলে গেটকিপারের কাজ করেছেন। তারপর মহীনগর, মেয়ের কলেজে চাকরী শুরু করেছেন। এই কলেজের তার আগে কোনও সমস্যা ছিল না। সমস্যা হল, যখন মেয়ে ভর্তি হলো। মনীন্দ্রনাথের একটা জীবনে দুটো নাটক শুরু হলো। কলেজে মেয়ের সামনে বেয়ারার নাটক আর বাড়ীতে মেয়ের সামনে বাবার নাটক।

বাড়ীতে ফেরার পর মায়া স্বাভাবিক ভাবেই বাবাকে ইন্টারভিউ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। মায়া বুঝতে পারেনি বাবার (মনীন্দ্র নাথ) ভিতর একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। সে উত্তেজনা নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইর। তাই প্রথম অবস্থায় মনীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবে দিলেও পরবর্তীতে সে

উত্তেজনা বেরিয়ে আসে। মনীন্দ্রনাথের উক্তিতেই একমাত্র তা বোঝানো যেতে পারে –

"কেন, আমি উর্দি পরলে তোমার সম্মানে লাগবে, ছেলে-মেয়েদের সামনে তোমার মাথা নিচু হবে যে তোমার বাবা উর্দিপরা বেয়ারা, বেয়ারাই যখন হয়েছি, বামুনের ছেলে যখন যতসব ছোটজাতের পায়ে তেল ঘষতেই পেরেছি, তখন আর আমার আছে কী, পরব, উর্দি পরে তোর কলেজে যাব, উঃ দুদিনের বৈরাগী, ভাতকে বলে অন্ন, বেয়ারার মেয়ে, বাপ উর্দি পরলে মেয়ের সম্মান থাকে না – [৮]

মায়া ব্যাপারটি এত এইভাবে ভাবেনি কিন্তু মনীন্দ্রনাথের কল্পনাতে বিস্তারিত ভাবে যা ঘটে যায় এবং অবচেতনে যা থাকে তারই বিস্ফোরণ ঘটে এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে শীতল যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি।

উপনিবেশোত্তর চেতনার আড়ালে লুকিয়ে আছে ঔপনিবেশিক শোষণ ও পীড়ন। এই শোষণ-পীড়ন যদি না থাকত তবে কখনও কোনো চেতনাবাদ গড়ে উঠত না আর সেই সঙ্গে সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটাও অসম্ভব ছিল। সাহিত্যিকরা যুগে যুগে সমাজের বাস্তব পটভূমিকে সাহিত্যের আকৃতি দিয়ে এসেছেন, যে কারণে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বদলে সমগ্র দেশবাসী এই পটভূমির সাক্ষী হয়েছেন। দেবেশ রায় তাঁর 'দখল' ছোটগল্পে সমাজের এমনই এক বাস্তব পটভূমি তুলে ধরেছেন যার সাক্ষী হতে আজ সমগ্র বঙ্গবাসী উদ্‌যোগী।

'দখল' গল্পে প্রথমেই আমরা তিস্তা নদীর একটা ভৌগলিক বিবরণ পাই। সেই বিবরণ অনুযায়ী তিস্তা নদীর পূর্বে দোমহনি, ধূপগুড়ি, লাটাগুড়ি আর পশ্চিমে পাহাড়পুর, রংধামালি, পাহাড়পুরের অধিকাংশ জমির মালিকানা আলি সাহেবের ও খানবাহাদুরের। জোতদার ও আধিয়ারের লড়াই চিরকালীন। বাহারপুরও এ লড়াই থেকে বঞ্চিত নয়। ভূমি আইন পাশ হওয়ার পর আধিয়াররা আরও মুশকিলে পড়ল। উৎপন্ন হল একদল বেকার চাষির। নিরুপায় চাষিরা ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হয়ে এর উপায়ন্তর খোঁজার জন্য ছুটল গ্রামের মাতব্বর বকরুদ্দিনের কাছে। 'দখল' গল্পে বকরুদ্দিনের বিবরণ থেকে আন্দাজ করা যায়, তিনি একজন ভদ্রশ্রেণীর প্রতিনিধি এককন্যা ও জামাই নিয়ে তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। জামাইকে পড়াশুনা শিখিয়ে একজন উঁচু মাপের মানুষ বাগানোর ইচ্ছাও তার মধ্যে দেখা যায়। চাষীদের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া তার মুখভঙ্গীতে স্পষ্ট। তিনি চাষীদের একজন নন, আবার তিনি চাষীদের থেকে আলাদাও নন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এটি একটি অনন্য গুণ। চাষীদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তিনি তাদের চাষবাস কেন্দ্রিক প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান অর্থাৎ তিস্তার চড়ে এবার ত্যামনা, অরিদাস, খোদাবক্স, জগু, অমনী এই পাঁচজন মিলে ধান উৎপাদন করবে। তবে জায়গাটা উর্বর কিনা তা নিয়ে সকলের মনেই সন্দেহ আছে। সাধারণত জমিতে চাষ করার সুযোগ থাকলে কেউ এই সমস্ত জায়গায় এসে চাষ করে না। এরপর শুরু হল চাষের আয়োজন। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি এক হিংসাত্মক দল তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল যা পনেরোদিনের মধ্যেই বোঝা গেল –

"পাতা-পানি, খুলবুলানি, হাঁটু-পানিত তুলবুলানি, গলা-পানিত ধূম"[৯] লৌকিক গানের মধ্য দিয়ে তিস্তার পারের চাষিদের জীবনযাত্রার কাহিনী উঠেয়াসে, গানটির অর্থ গল্পেই বিবৃত হয়েছে – "বানের জলে যখন পায়ের পাতা ডুবেছে তখন পায়ে যেন সুড়সুড়ি লাগছে, তাই হাঁটু জলে সুখ নিদ্রা, বুক জলে মনে হয় বৌয়ের আদর, গলা জলে বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য চেঁচামেচি"[১০] জোতদারের ধান খাওয়া আর গালাগাল শোনা এখানকার চাষীদের অত্যন্ত সাধারন ঘটনা।

তিলকচন্দ্র তিস্তাপারের একজন বিখ্যাত দেউনিয়া। তার পোষাক আর্ষাক, চালচলন, কথাবার্তায় একটা রাজসিক ভাব রয়েছে। তিলকচন্দ্র অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্ত। রাজনৈতিক গতিধারা তার রক্তের প্রতিটি কণায় বিরাজমান। তাই সাত আট বছর আগে যে তিলকচন্দ্রকে কেউ চিনত না বর্তমানে সে সকলের উর্দে। সকল ধরণের ভোটাভুটীতে আজ তারই জয় জয়কার। তার এলাকার সমস্ত ক্রিয়াকর্মতে তার হস্তক্ষেপ অনিবার্য। অহংকারী তিলকচন্দ্র যখন খবর পেল পাহাড়পুরের চাষীরা তিস্তার চড়ে চাষবাস শুরু করেছে তখন তিলকচন্দ্র পক্ষে তা সহ্যকরা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তার অনুমতি ছাড়া এই দখলদারি সম্ভব হল কী করে, তা বোঝা কষ্টকর। নিতান্ত অপমানিত হয়ে এর প্রতিশোধ নিতে তিনি ছুটে গেলেন তিস্তার চড়ে। অপমানজনিত ধমক ও নোটিশের মাধ্যমে অমনীদের দমিয়ে তবে তিনি কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন।

মুখের গ্রাস যখন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মুখের সামনে থেকে কেড়ে নেওয়ার চরম মুহূর্ত আসে তখনই দেখা দেয় বিভিন্ন চেতনা উত্তরণ। অমনী, অরিদাসক, জগু, জ্যামনা, খোদাবক্স এই পাঁচজনের সাথে ঘটল একই ঘটনা। বকরুদ্দিন ও সামসুলের (জামাই) বুদ্ধিতে তাদের বিপদে ডেঙ্গুয়া ঝড়ের শ্রমিকরা মাঠের পাকা ফসল নিয়ে পাঁচজন চাষীর জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। সূর্যোদয়ের আগে সকলে মিলে ছুটল এই উদ্দেশ্যে যে তিস্তার চড়ের ধান কেটে ফসল নিয়ে আসতে হবে ঘরে। তিলকচন্দ্র নামক ঔপনিবেশিক শক্তিকে হারানোর শ্রেষ্ট উপায় এটাই। এই যুদ্ধে অমনী, খোদাবক্স, ত্যামনা, জগু, অরিদাস এরা প্রতিনিধি হলেও কাহিনীতে শুধু আর তারাই নায়ক হয়ে থাকলেন না। কারণ ডেঙ্গুয়াঝড়ের কুলিরাও এখানে একই সমমর্যাদার অধিকারী। দখলদারির যুদ্ধ কেবল তিলকচন্দ্র পাঁচজন চাষীর থাকল না। যুদ্ধটা যেন দেউনিয়া তিলকচন্দ্র নামক শোষক শ্রেণীর সাথে পঞ্চাশজন চাষী বা শোষিত শ্রেণীর, যাদের সাথে ছিল তীর-ধনুক (তীর ধনুককে জয়ের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা যায়)।

তাদের জয়যাত্রার বর্ণনা লেখক অত্যন্ত সৌন্দর্যপূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে দিয়েছেন--

"স্রোতের তখন তীব্রতা ছিল, সূর্যোদয়ের রক্ত নদীস্রোতে বহতা ছিল এবং একটি রাম সিতা সুর্যের দিকে উদ্যত করে যে দীর্ঘ গম্ভীর নাদ সৃষ্টি করা হল, তা পুরাকালে বিজয়ী রাজার যুদ্ধযাত্রার সূচনার মত শোনাল। পুরাকালে রাজারা এই ঋতুতেই দিগ্বিজয় বের হতেন।[১১]

ঔপনিবেশিক শাসনের বিষাক্ত গ্যাস ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে যখন ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই এর থেকে উত্তরণের জন্য দেখা দেয় বিভিন্ন চেতনার আশ্রয়। কিন্তু এই শাসকগোষ্ঠী যে ইতিমধ্যে তাদের বিষক্রিয়া দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় তার প্রমাণ মিলে দেবেশ রায়ের রচিত বিভিন্ন গল্প কাহিনীতে। 'ক্ষুধায় জন্ম-মৃত্যু' কাহিনীটি এই বিষক্রিয়া থেকে আলাদা কোন ঘটনা নয়। স্বাধীন ভারতও যে এর থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি তার উদাহরণ আজও পথে ঘাটে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসক দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের তৈরী করা মায়াজালের মোহে আজও আমরা আচ্ছন্ন।

'ক্ষুধায় জন্ম-মৃত্যু' কাহিনীটিতে শাসকগোষ্ঠীর শাসনের প্রতিক্রিয়ার একটি ছবি দেখা যায়। সাধারণ দরিদ্র মানুষরা যে এই কারণে কতটা জর্জরিত তা আলোচনার উর্দে। যে দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষরা কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল সেই দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষদেরই অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার চওড়া দামে কিনে খেতে হয়। 'কো-অপারেটিভ থেকে মানুষদের চাল কেনার লড়াই ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শহরেই দেখা যায়। এই কাহিনীতেও চাল কেনার লড়াই হলো ঔপনিবেশিক শষণের বিরুদ্ধে মুখ্য অস্ত্র। দুপুর

বারোটা থেকে চালের দোকানের ৫৮ নং বড় দরজা খুললে ক্ষুধার্তরা চালের দর্শন পাবেন। সেই দর্শনের জন্য হয়তো গত রাত্রিতে কেউ ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। সকাল ছ'টা থেকেই দোকানের বড় দরজার সামনে লাইন লেগে যায়। বৃষ্টি কাদার মধ্যে বাজার সকল অনাহারীরা লাইনে অপেক্ষারত অবস্থায় দাঁড়ানো। মেয়েদের লাইন ও ছেলেদের লাইন এই দুটো ভাগে দুটো লাইন রয়েছে। সুবিধে বুঝে লাইনগুলো এদিকে সেদিকে বেঁকে গিয়েছিল। বৃষ্টি-কাদা-জল ইত্যাদিতে বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষার কারণে অপেক্ষারত মানুষগুলোর মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। তাদের এক একজনের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা এক একরকম। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে গভীর অমিল থাকলেও একটি মিল অবশ্যই লক্ষণীয়, সেটি হলো তৃষ্ণার্ত চক্ষুজোড়া। ৫৮ নং দরজার ভিতরের চালের পাহার কখন তাদের দর্শন দেবে এইরকম পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা চলতে থাকে। তাদের কথাবার্তা থেকে শাসকদলের কুচক্রান্তের বিষজালের কথাই মনে আসে। চাল প্রত্যেককে হয়তো আড়াই কেজি করে দেয়া হবে, তাই নিয়ে এত মারামারি। শহরের বাইরের লোক চাল নিতে আসলে স্থানীয় বাসিন্দারা এতে বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ চক্রান্ত করেছে রাজনৈতিক দলেরা আর আমরা নিজেদেরকেই নিজেরা দোষারোপ করছি। লাইনের অনেক ব্যক্তির আবার এই প্রতিবাদে যোগদানের সামান্য শক্তিটুকুও নেই। পেটের ক্ষিধে মেটানো ছাড়া এরা আর কিছু চায় না। কেউ কেউ অসহায় শিশুকে লাইনে আশ্রয় দিতে গেলে তাকে বহু কটু কথা শুনতে হয়। এই যাবতীয় কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে জানা যায় চালের মান উৎকৃষ্ট নয়। অথচ লাইন ক্রমাগত লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চালের মান এবং এই চাল নিয়ে কত ঘটনা হচ্ছে তারও ইঙ্গিত কাহিনীতে আছে ---

... গত চার তারিখে পাইকারদের সঙ্গে ডি. এম এর মিটিং হয়েছিল, সেখানে তাদের নাকি এই চাল বেচার জন্য গর্ভমেন্ট রিকোয়েস্ট করে, তারা বলে এ চাল তারা বেচবে না। গর্ভমেন্ট যদি চুরাশি পয়সা কেজি বিক্রি করতে দেয়, তবে নাকি তারা চাল এনে ভাসিয়ে দেবে। বলেন কি? আরে শোনেন না, গর্ভমেন্ট আশি পর্যন্ত রাজি হয়েছিল, বলেন কি পাইকাররা ব্ল্যাক কততে করবে, তাই নিয়ে গর্ভমেন্ট নিগেশিয়ট করছে?[১২]

দরিদ্রের রক্তে পরিপুষ্ট শোষকের দল যখন আত্মমত্ততায় ব্যস্ত তখনই অজস্র লোকের লাইনে এক বৃদ্ধ তার দুর্বল শরীর নিয়ে অবচেতনে প্রবেশ কজরলেন যেখানে চলতে থাকল কল্পনার লীলা কাণ্ড। কল্পজগতে বিভিন্ন প্রশ্নউত্তরের মধ্য দিয়ে হঠাৎ এমন একটা শব্দ শোনা গেল যাতে ঔপনিবেশিক শোষণের স্মৃতি মনে আনতে আমরা বাধ্য, শব্দটি হলো 'খিদে', বৃদ্ধ তার কল্পনায় উড়তে উড়তে গিয়ে ৫৮নং দরজার সামনে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন মৃত মানুষদের সাদা হাড়ের মত সাদা চালের পাহাড়, সেই পাহাড়ে তিনি উড়ান অভিমান চালান। কিন্তু অকস্মাৎ চালের মধ্যে ডুবে তার দমবন্ধ হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ বাস্তব জগতে লাইনের চতুর্দিক থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার চিৎকার উঠে। কিন্তু চালের লাইন অভঙ্গ অবস্থায় থাকে।

মেয়েদের লাইন যখন তীর্থের কাকের মত বসতে বসতে অতিষ্ঠ হয় তখনই ঘোষিত হয় মেয়েদের লাইন এখানে নয় - দুই নম্বর শেডে - দুই নম্বর শেডে লাইন ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা বলা যায় শীঘ্র ক্ষিধে নিবারণের তাগিদে সকলেই ছুটে গেল। মুহূর্তে দু-নম্বর শেডে মারপিট লাগল। ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধা কোনো এক আঘাতে দূরে ছিটকে পড়লেন। পরের জন তাকে টপকে গেলেন। এরপর যে ছিল সে তাকে তুলল এরকম পরিস্থিতিতে নানাধরণের নোংরা বার্তালাপ তাদের মধ্যে চলতে থাকে। লাইনের প্রথম দুজন মেয়ে যারা চালের বস্তার একেবারে নিকটেই ছিলেন

তারা একটি খুঁটি প্রায় জড়িয়ে ধরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর বাকি পুরো লাইনটাই ছিন্ন ভিন্ন। অকস্মাৎ সরকারি পুলিশের আগমন ঘটে এবং চালের বস্তা ও লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুঁটি জড়িয়ে ধরা মেয়েগুলোর হাতে পুলিশ সজোরে আঘাত করলে মেয়েগুলো প্রায় দৌড়ে চালের বস্তা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তাদের আঘাতে লাইনে একবৃদ্ধা ছিটকে পড়ে এবং কোন শক্ত জায়গায় আঘাত লেগে বৃদ্ধার রক্তে স্নান করতে হয় পুরো বাজারটাকে। অপরদিকে লাইনের চিৎকার ও পুলিশের আঘাতে ক্ষুধার্ত দেহগুলোর ক্ষুধা নিবারণের উপায় থেকে ক্রমাগত দূরেও আরও দূরে চলে যাচ্ছে। এই পুরো ঘটনাটাই হিংস্র, রক্তহীন, চক্ষুলজ্জাহীন প্রতিহিংস্রা পরায়ণ শাসকগোষ্ঠীর ক্রিয়াকর্ম। দরিদ্র মানুষরা তাদের শিকার হতে বাধ্য। নিজেদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে তারা উপর থেকে বসে খেলা দেখে। সমস্ত এলাকাতে নোংরা ছড়িয়ে সেই নোংরার ছিটেটা পর্যন্ত তাদের শরীরে তারা লাগতে দেয় না। তাই উক্ত ঘটনাকে তারা এভাবে ঘোষণা করল – 'এক বাজারে সরকারি চাউল বিক্রয় কেন্দ্রে কিছু নারী লুণ্ঠন করতে যাওয়ায় পুলিশ উহাদের বাধাদান করে। ভিড়ের চাপে ঘটনাস্থলে একটি বৃদ্ধার আকস্মিক মৃত্যু হয়।"[১৩]

শোষণের এই ভয়াবহতা ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে যা থেকে পরিত্রাণ পেতে ভারতবাসীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও মুক্তি এখনও পায়নি।

দেবেশ রায় কোনোদিনই কৃত্রিমতার ধার ধারেননি। উল্লেখিত গল্পগুলি বিভিন্ন ধাঁচের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি পটভূমিকে কেন্দ্র করে পরিপুষ্টতা লাভ করে তাঁর ছোটগল্পের অনুবিশ্ব এবং কোনো কিছুরই যে পুনরাবৃত্তি তিনি করেন না তার প্রমাণও মিলে তাঁর ছোটগল্পগুলির মাধ্যমে অসীমে ছড়িয়ে পড়েন। গল্প রচনার পুরাতন রীতিকে অমানয় করে আধুনিকোত্তর যুগের আনাচে কানাচে যিনি ছড়িয়ে পারেন তাঁর কোনো সীমা থাকতে পারে না। তাই তো এও ছোট গল্পের ভূমিকায় তাঁর স্বগতোক্তি পাওয়া যায় --

গত শতকের শেষার্ধ থেকে আরো অনেকের অনেক গল্পের সঙ্গে এই গল্পগুলিকেও নিয়ে বাংলা গল্পে আধুনিকতার আন্দোলনের একটা কথা চলছে। সে আন্দোলন এই গল্পগুলির অব্যবহিত হলেও কেউ যেন দয়া করে তাকে "নতুন রীতি" অভিধা দিয়ে না বসেন। ঐ অভিধা আমি স্বীকার করিনা।[১৪]

তথ্য সূত্র :

১। *শিল্প সাহিত্য*, দেবেশ রায়, সংখ্যা ২০১০, অনিন্দ্য সৌরভ, পৃঃ ১৪৪।
২। অনুরূপ।
৩। *দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২*, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৩৫।
৪। তদেব, পৃঃ ৫৬।
৫। তদেব, পৃঃ ৬৭।
৬। তদেব, পৃঃ ৮৯।
৭। তদেব, পৃঃ ১২০।
৮। তদেব, পৃঃ ১৩৬।
৯। তদেব, পৃঃ ১৪১।
১০। তদেব, পৃঃ ১৪১।

১১। তদেব, পৃঃ ১৫১।
১২। তদেব, পৃঃ ১৯১।
১৩। তদেব, পৃঃ ১৯৫।
১৪। শিল্প সাহিত্য, দেবেশ রায়, সংখ্যা ২০১০, অনিন্দ্য সৌরভ, পৃঃ ৭৩।